গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৫ সংখ্যা-৩ মে-জুন ২০১৮ RNI No WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

❑ প্রচ্ছদ কথা : হকিং ২ ❑ যে গাছ দুধ দেয় ৭ ❑ গবেষণা ৮ ❑ মহিলা বিজ্ঞানী ৯

❑ চোখে যখন সূর্যগ্রহণ ১০ ❑ অঙ্ক : মৌলিক সংখ্যা ১১ ❑ যারা হারিয়ে যাচ্ছে ১২

❑ রত্নে রোগ চিকিৎসা ১৩ ❑ জানো কি ১৩ ❑ সংবাদ ১৪ ❑ শব্দের খোঁজে ১৬

❑ কবিতা / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা : অনুপ্রেরণার উৎস

*ঐ যে হুইলচেয়ারে বসে আছে সদাহাস্যময় মানুষটি। তিনি মারণরোগ অ্যামিওট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস রোগাক্রান্ত। হাত-পা-দেহ জড়বৎ। যদিও মস্তিষ্ক ভীষণ জীবন্ত। শুধুমাত্র মুখের পেশীর নাড়া-চাড়াতে বাক্য গঠন করছেন। তা স্পিচ সিনথেসাইজারের মাধ্যমে শ্রোতাকে শোনাচ্ছেন। ডাক্তারদের মৃত্যুনিদান হাঁকার পরও আরও পঞ্চান্ন বছর যিনি ভীষণভাবে বেঁচে থাকলেন। তিনি স্টিফেন হকিং, ১৪ মার্চ, ২০১৮ জীবনের জন্য তাঁর লড়াই শেষ করলেন। শেষ হল তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের খোঁজ। তিনি বলেছিলেন— **"আমি পেতে চাই অনন্ত বিশ্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। জানতে চাই, কেন বিরাজিত এই ব্রহ্মাণ্ড? আর যদি বিরাজিতই, তবে কেন দেখছি এই চেহারায়, অন্যভাবে নয়।"** তিনি ছিলেন সকল অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর অনুপ্রেরণার উৎস। আর আমরা যারা, কেবলমাত্র যুক্তি চিন্তা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করি তাদের জন্য থাকলো তাঁর অমোঘ বাণী— **"মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্য বিজ্ঞানই একদিন উন্মোচন করতে সমর্থ হবে। ভগবানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।"** তাঁর অবস্থান হুইল চেয়ারে। কিন্তু তাঁর অবস্থান বিশ্বজুড়ে, অনুসন্ধানে, মনে মনে। তাঁর হাত ধরেই জানতে পারলাম 'বিগ ব্যাং থিয়োরি' —ব্ল্যাক হোল— সিংগুলারিটি—ইভেন্ট হরাইজন। বললেন,— **"ব্ল্যাক হোল থেকেও এক ধরনের বিকিরণ আসে। তার ফলে ব্ল্যাক হোলের ভর কমতে কমতে একদিন উবে যেতে পারে।"** তাঁর আবিষ্কারের সূত্রেই বিকিরণের নাম হল 'হকিং রেডিয়েশন'। চেয়েছিলেন তাঁর স্মৃতিফলকে গ্রথিত থাক রেডিয়েশন সূত্র $S = \pi Akc^3/2hG$। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন! ভবিষ্যতের মহাবিজ্ঞানীদের দিকে ছুঁড়লেন চ্যালেঞ্জ— বিশ্বের সমগ্র রহস্যকে একটি সূত্রে 'থিওরি অফ এভরিথিং'-এ আনতে।*

*শুধু বিজ্ঞানী নয়, হকিং দেশ-জাতি-ধর্ম-পেশা-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর বিজ্ঞান, চেতনা ও জীবনবোধ দিয়ে। তাঁর লেখা 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'— এক কোটি বিক্রি ছাড়িয়েছে। সকল ধরনের লেখকের কাছেই একাধারে অনুপ্রেরণা ও চ্যালেঞ্জ। আবার ভিয়েতনামের যুদ্ধ বা উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রতিবাদে তাঁর দৃঢ় অবস্থান— সকল অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের কাছেই অনুপ্রেরণার উৎস। এই সেদিন পরিবেশ ধ্বংসে ব্যথিত হয়ে বললেন— **"পৃথিবীর আয়ু আর ১০০ বছর।"** অনুপ্রাণিত হলেন পরিবেশ প্রেমীরা। আসলে হকিং ছিলেন মানবদরদী। তিনিই বলতে পারেন— **"তোমার ভালবাসার মানুষদের বাসভূমি না হলে আর ব্রহ্মাণ্ড কিসের জন্য?"** এ যেন সকল ভালবাসার জীবেদেরই কথা। এমন মানুষই তো পারে সকলকে উৎসাহিত করতে। বলতে পারেন—*

"পায়ের দিকে নয়, মাথার ওপরে নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চেষ্টা করুন, যা দেখছেন, তা বুঝতে। কেন বিশ্ব আছে, তা জানতে। অনুসন্ধিৎসু হোন। জীবন কঠিন হতে পারে। তবে জানবেন, আপনার জন্য করার এবং করে সফল হওয়ার কাজ কিছু থাকবেই। হাল না-ছাড়াই বড়ো কথা।"

আমরা বরং গুপীর গলায় গেয়ে উঠি ঃ

ম-হা-রা-জা তোমারে সেলাম, সেলাম।

মহাকাশের শূন্য মাধ্যাকর্ষন তৈরি করে হকিং-এর ইচ্ছে ভাসান।

র ত ন দে ব না থ

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং : মহাবিশ্বদ্রষ্টা

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং বিজ্ঞানের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূরে ঠেলে অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে আমরণ বিজ্ঞানের গবেষণায় ডুবে থাকা এক প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী উইলিয়াম হকিং।

১৯৪২-এর ৮ জানুয়ারি অক্সফোর্ড (ইংল্যান্ড)-এ জন্ম হকিং-এর। পৈতৃক ভিটা উত্তর লন্ডনে। বছর আটেক যখন তাঁর বয়স তাঁদের পরিবার স্থানান্তরিত হয় লন্ডনের ২০ কিমি উত্তরে সেন্ট আলবান্‌স-এ। ১১ বছর বয়সে স্টিফেনকে ভর্তি করা হল সেন্ট আলবানস স্কুলে।

হকিং যখন অন্য ছাত্রের মতো

আলবানস স্কুলের সময়টা সুখের কাটেনি হকিং-এর। না পড়াশুনোয়, না খেলাধুলোয়। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গেও তেমন দহরম-মহরম ছিল না তাঁর। স্কুলে কৃতী ছাত্র হিসাবেও শিক্ষক মহাশয়দের মন কাড়তে পারেননি তিনি। তাঁর নিজেরই কথায় আট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ভালো করে পড়তেও পারতেন না এবং লেখাপড়ায় তাঁর ফল তাঁর ক্লাসের বন্ধুদের তুলনায় তেমন ভালো ছিল না। তা হলে হবে কী? তাঁর বন্ধুরা কিন্তু তাঁকে আইনস্টাইন বলেই ডাকতেন। তার কারণও অবশ্য ছিল। অত ছোট বয়সেও কাল এবং সময়ের ধারণা রপ্ত করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সামাজিক কাজে যতটা মন ছিল, তার বিন্দুমাত্রও স্কুলের কাজে ছিল না। অঙ্ক এবং পদার্থ বিজ্ঞানের যে কোনও সমস্যার সার যেহেতু চট করেই ধরে নিতে পারতেন তাই স্কুলের কাজ নিয়ে তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

স্কুলের পাঠ শেষে ১৯৫৯-এ ভর্তি হলেন ইউনিভার্সিটি কলেজ, অক্সফোর্ডে। বাবার ইচ্ছা ছেলে হোক চিকিৎসক। কিন্তু ছেলের মন পড়ে রয়েছে গণিতের দিকে। ইউনিভার্সিটি কলেজে যেহেতু সেসময় গণিত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না তাই বাধ্য হয়েই পদার্থবিদ্যা বিষয়কেই বেছে নিলেন তিনি। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় তাঁর আকর্ষণ হয়ে উঠল তীব্রতর। ১৯৬২ তে পদার্থবিদ্যায় প্রথম

অক্সফোর্ডে বন্ধুদের সাথে। সারিতে সবার উপরে।

শ্রেণিতে স্নাতক হলেন। শুরু হল স্নাতকোত্তর পড়াশুনো। তারপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগে শুরু হল গবেষণা। গবেষণার বিষয় 'সৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি'।

ইচ্ছা ছিল বিখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্ববিদ ফ্রেড হোয়েল-এর অধীনে করবেন গবেষণা। কিন্তু ফ্রেড হোয়েলের পক্ষে হকিংকে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুটা হতাশই হলেন হকিং। খোঁজ পাওয়া গেল আর এক জনের। যিনি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার কাজ করান। অধ্যাপক ডেনিস সিয়ামা। হকিং-এর কাছে যিনি একেবারেই অপরিচিত। সিয়ামার অধীনে গবেষণা করে ১৯৬৬ সালে ডক্টরেট হলেন। গবেষণার বিষয় 'প্রসারমান মহাবিশ্বের ধর্ম'। গবেষণা শেষে রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান গনভিল আন্ড কিজ কলেজে। এরপর যোগদান করেন ইন্সটিটিউট অফ আস্ট্রোনমিতে ১৯৬৮ সালে। পাঁচ বছর সেখানে কাটিয়ে ফিরে এলেন কেম্ব্রিজে। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে শুরু করলেন কর্মজীবন। ১৯৭৫-এ সেখানেই গ্র্যাভিটেশনাল ফিজিক্সে রিডার পদে উত্তরণ। ১৯৭৭-এ সেখানেই হলেন প্রফেসার। ১৯৭৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান প্রফেসার অফ ম্যাথমেটিকস পদে ছিলেন তিনি। হেনরি লুকাসের নামাঙ্কিত পদটি বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানীয় শিক্ষক পদ। প্রফেসার হকিং-এর আগে যে পদে আসীন ছিলেন আর এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

রহস্যবৃত্ত কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯১৫ সালে। কৃষ্ণ-গহ্বর আজও অধরা, হেঁয়ালিতে ভরা। উইলিয়াম হকিং-এর গবেষণায় আলোকিত হয়েছে আলোক আগ্রাসী কৃষ্ণগহ্বর। প্রাথমিক অনুধাবনে এটা মনে হয়েছিল যে, কৃষ্ণগহ্বরের ইভেন্ট হরাইজন অর্থাৎ যে সীমারেখার পর গেলে কোনও কিছুই কৃষ্ণগহ্বরের থাবা এড়াতে পারে না, তার এক্তিয়ার কখনই ছোট হতে পারে না। তাপীয় গতিবিদ্যার সূত্রানুসারে, কোনো আবদ্ধ সংস্থার এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলা কখনই কমে না। এই ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৭০-এর

প্রথম স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে হকিং সম্মানিয় শিক্ষক পদ নিতে কেমব্রীজে।

দশকে পদার্থবিদ জ্যাকব বেকেন্সটাইন কৃষ্ণগহ্বর-এর এনট্রপি এবং তার ইভেন্ট হরাইজন-এর ক্ষেত্রফলের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম হকিং ব্যাপারটি তেমন আমল দেননি। কৃষ্ণগহ্বর এবং এনট্রপির মধ্যে কোনও সম্পর্ক না থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। কেননা কৃষ্ণগহ্বর থেকে যে কোনও রকম বিকিরণই বেরোয় না। আর বিকিরণ বিহীন এনট্রপি কল্পনা করা যায় না। আবার ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়েও দিলেন না। ১৯৭৪ সালে হকিং হেঁয়ালির সমাধান করলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে। সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের একসাথে প্রয়োগ করে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণগহ্বর সত্যিই শক্তি বিকিরণ করে। কৃষ্ণগহ্বর থেকে এই বিকিরণ 'হকিং রেডিয়েশন' বা 'হকিং-বেকেনস্টাইন' রেডিয়েশন' নামে বিখ্যাত। যদিও এই বিকিরণ হাতে কলমে ধরা যায়নি এখনো তবু অনেক পদার্থবিদের ধারণা এই বিকিরণের অস্তিত্ব রয়েছে। আর তাই যদি হয় তবে সর্বগ্রাসী ব্ল্যাকহোলও শক্তি বিকিরণ করে এক সময় বিলীন হয়ে যাবে।

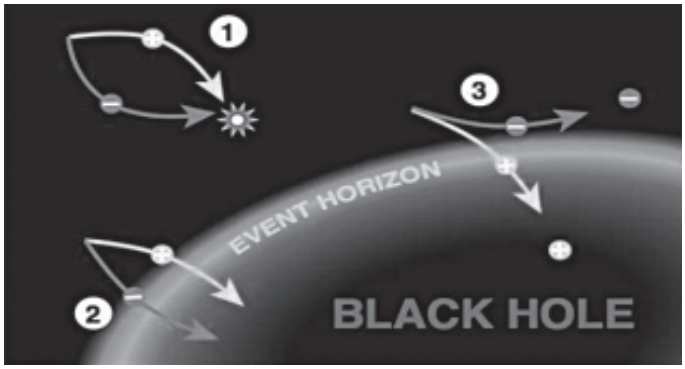

হকিং রেডিয়েশান। যে কাল্পনিক কণা কৃষ্ণগহ্বর থেকে রক্ষা পেল।

প্রফেসার হকিং শারীরিক দিক থেকে আর পাঁচটা মানুষের মতো স্বাভাবিক ছিলেন না। সেটা ১৯৬৩ সাল। তখন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আইস-স্কেটিং করতে গিয়ে হঠাৎই গেলেন পড়ে। চিকিৎসায় ধরা পড়ল আমিওট্রফিক ল্যাটেরাল স্ক্লেরোসিস— এক ধরনের মোটর নিউরোন ডিজিজ। বয়স তখন মোটে একুশ বছর। হয়ে পড়লেন পঙ্গু। চলচ্ছক্তিহীন। হুইল চেয়ারই হল একমাত্র সম্বল। মুখের অধিকাংশ পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। বাকশক্তি হল সীমিত। চিকিৎসকেরা তাঁর আয়ু বেঁধে দিলেন আর দু-আড়াই বছর। তা অবশ্য হয়নি। চিকিৎসা এবং মনের জোরে কাটিয়ে দিয়েছেন আরও অর্ধশতকেরও বেশি সময়। তা না হয় হল। মৃত্যু তাঁর পিছু যেন ছাড়তেই চায়নি। ১৯৮৫ সালে একবার জেনেভা যাত্রার সময় আক্রান্ত হলেন নিউমোনিয়ায়। মরণাপন্ন অবস্থা। শ্বাসকষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ট্রাকিওটোমি অপারেশনে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলেও বাকশক্তি চলে গেল চিরতরে। স্পিচ সিনথেসাইজার যন্ত্রে চলতে থাকল মনের কথা ফুটিয়ে তোলা। তবে এত বড় বিষয়কেও তিনি জীবনের পরাজয় হিসাবে মেনে নেননি। বরং তাঁকে করে তুলেছে আরও অপ্রতিরোধ্য, আরও দুর্বার। হাত-পা তাঁকে সাথ না দিলে হবে কী? মনে মনে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড। আর পরখ করে দেখেছেন ব্রহ্মাণ্ডের কান্ড-কারখানা, তার রকম সকম।

জীবনের শেষ দিকে এসে বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন হকিং। বিশেষত নিজের চিন্তা-চেতনা প্রসূত বিজ্ঞানের দিকগুলি সাধারণের বোধগম্য করে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আম জনতার মাঝে। পাশাপাশি আর্থিক সংস্থানও হচ্ছিল। কেননা তাঁর প্রতিদিনকার চিকিৎসার ব্যয় ছিল বিপুল পরিমাণ। শুধুই অনুদানের মাধ্যমে সেই অর্থের সংস্থান করা ছিল এক কঠিন কাজ।

সত্যিই কর্মময় জীবন ছিল স্টিফেন হকিং-এর। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হারাতে পারেনি তাঁকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেয়াল করেছেন মহাবিশ্ব-মহাকাশ। কেবলই মাথার জোরে। ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ দেহাবসান হয় এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর।

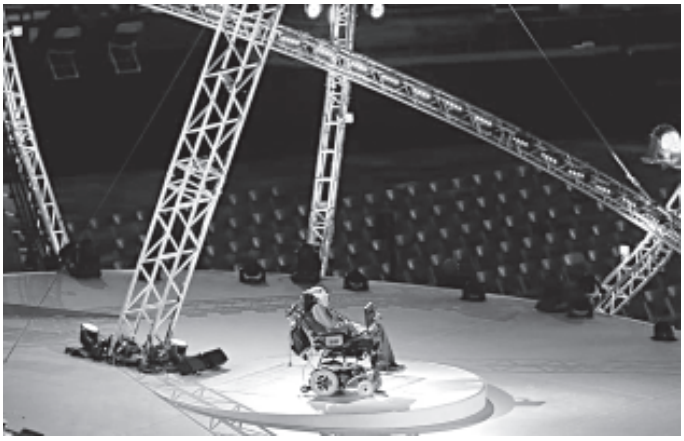

বক্তৃতারত হকিং

M : 9477934928 ● E-mail : rdebnath1961@gmail.com

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

বিজ্ঞান লেখক স্টিফেন হকিং

স্কেচ : সম্রাট সরকার

অধ্যাপক স্টিফেন হকিং-এর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধাণ কারণ ছিল জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা ও বক্তৃতাবলী। বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি মহাবিশ্ববিজ্ঞানের জ্ঞান ভান্ডারকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন সাধারণের কাছে। ১৯৭০ সালের পর থেকেই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষক মহলে যথেষ্ট পরিচিতি পেলেও স্টিফেন হকিংকে আরো প্রায় দু'দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমজনতার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে। ১৯৮৮তে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই A Brief History of Time। হকিং-এর নিজের কথায় আমি এমন একটি বই লিখতে চেয়েছিলাম যা বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেফ্রি আর্চারের বইয়ের পাশাপাশি এয়ারপোর্টের বুকস্টলগুলিতে পাওয়া যাবে। সত্যি হয়েছিল বিজ্ঞানীর

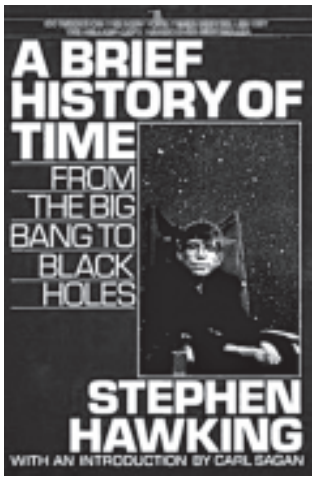

স্বপ্ন। নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার লিস্টে একনাগাড়ে ১৮৭ সপ্তাহ এবং লন্ডনের টাইমস পত্রিকার বেস্টসেলার লিস্টে ২৩৭ সপ্তাহ থেকে অনন্য নজির গড়েছিল এই জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইটি। ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক কোটির বেশি (২০১৩ সাল পর্যন্ত) বিক্রি হয়েছিল তাঁর এই বই। সহজ গদ্যে বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলো সাধারণের জন্য লিখেছিলন হকিং। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ ছাড়া আর কোনো গাণিতিক সমীকরণ এই বইতে তিনি ব্যবহার করেননি। বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কার্ল সাগান কয়েকটি সাধারণ কৌতূহলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সাগানের কথায় 'প্রকৃতিকে আমরা যেমন দেখি, প্রকৃতি কেন এমন হল, মহাবিশ্ব কোত্থেকে এলো, কিংবা মহাবিশ্ব কী সবসময় এখানে ছিল, কালস্রোত কী কখনো পশ্চাদ্‌গামী হবে এবং কার্যকারণের পূর্বগামী হবে অথবা মানুষের পক্ষে যা জানা সম্ভব তার কী কোনো চরম সীমা আছে? ...পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ কী? আমরা কেন কেবল অতীত মনে রাখি ভবিষ্যত কেন মনে রাখি না? ...কেবলমাত্র একটাই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব কেন রয়েছে?' সাফল্যের সঙ্গে এইরকম অনেক কৌতূহল নিরসন হকিং করে গেছেন তাঁর এই বইতে। প্রথাগত উচ্চবিজ্ঞানশিক্ষা ছাড়া সাধারণের জানা ও বোঝার জন্য সত্যিই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল এই A Brief History of Time বইটি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কোপেনহেগেনের নীল্‌স বোর ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক জেকব বোরজেইলি-র কথা। হকিং-এর মৃত্যুর পর তিনি জানিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে A Brief History of Time বইটি পড়ে তাঁর মধ্যে স্থান-কাল (space-time)-এর আপাত অচেনা প্রভাব নিয়ে প্রথম ঔৎসুক্য জেগেছিল। ঠিক ২০ বছর বাদে বিজ্ঞানী জেকব অধ্যাপক হকিংয়ের সঙ্গে যৌথ তাত্ত্বিক গবেষণাতেও অংশ নিয়েছিলেন। তবে ভাষার সারল্য সত্ত্বেও বিষয়ের দুর্বোধ্যতায় এই বইটি অনেকের কাছেই অপাঠ্য হয়ে উঠেছিল। আখ্যা পেয়েছিল The most unread book হিসাবে। হাল ছাড়েননি হকিং। অনেক ছবি সহযোগে আরো সহজ করে লিখেছিলেন A Brief History of Time : A Readers Companion, The Illustrated A Brief History of Time এবং A Briefer History of Time এর মতো বই।

A Brief History of Time প্রকাশের পর থেকেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন অধ্যাপক স্টিফেন হকিং। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় Black Hole and Baby Universes and others essays। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে ১৪টি প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো এই বইতে দুরারোগ্য মোটর নিউরোনের অসুখ (ALS) ও আত্মজৈবনিক ঘটনা পরম্পরার সাথে স্টিফেন মিলিয়েছেন নিজের বিজ্ঞান-দর্শন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় নিজের গবেষণালব্ধ ভাবনাগুলিকে।

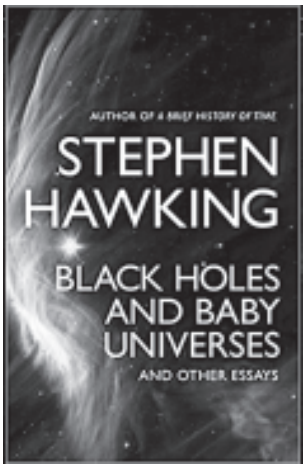

তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়েছে মানবসভ্যতার প্রজ্ঞা। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন স্ট্রিং থিওরির কথা। সময়টা ২০০১ সাল। আবার বই লিখলেন অধ্যাপক হকিং। ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ, স্ট্রিং থিওরি, স্টার ট্রেক, টাইম মেশিন এবং প্রাণের একক DNA সবকিছুকে নিয়ে আধুনিক গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচুর ছবি সহ প্রকাশিত হল সুদৃশ্য বই The Universe in a Nutshell। সুখপাঠ্য বইটি ২০০২

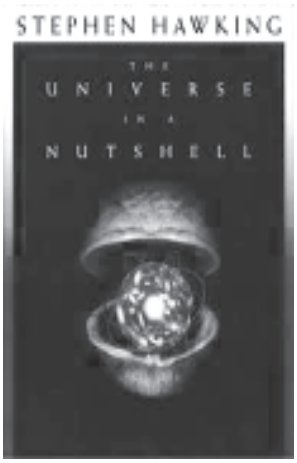

সালে সম্মানীয় Royal Society Insight Investment Science Book Prize পেয়েছিল।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বই ছাড়াও প্রথাগত বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কথা মাথায় রেখে এই দশকে আরো দুটি বই লিখেছিলেন অধ্যাপক হকিং। ২০০২ সালে প্রকাশিত হয় On the Shoulders of Giants। ১২৮০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বইটিতে আছে কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইনদের বাছাই করা মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধগুলি। মূল প্রবন্ধগুলির সঙ্গে লেখক হকিং শুনিয়েছেন কী করে এই মহান বিজ্ঞানীদের গবেষণা জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে আধুনিক পদার্থবিদ্যার যাত্রাপথকে সুগম করেছে। ঠিক তিন বছরের মাথায় প্রকাশিত হয় আরেকটি বই God Created the Integers। ঠিক আগের বইটির মতো এই বইতেও তিনি বেছে নিয়েছেন ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, ল্যাপলাস, নিউটন সহ

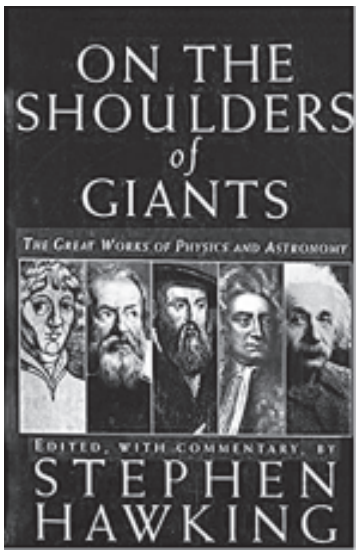

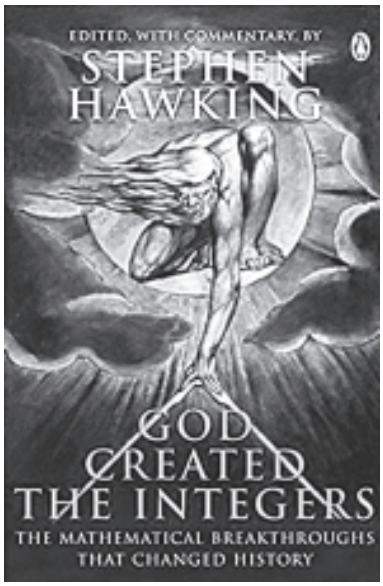

১৫ জন বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞের ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যকে। অধ্যাপক হকিংয়ের সম্পাদনায় ১১৮৪ পৃষ্ঠার এই বইটি যেন হয়ে উঠেছে দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে চলতে থাকা পরিবর্তনশীল গণিত ভাবনার সাফল্যের খতিয়ান। বিভিন্ন সময়ে রজার পেনরোজ, কিপ থর্ন, লিওনার্দ লোদিনো সহ আরো কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে যৌথভাবে বই লিখেছিলেন স্টিফেন হকিং।

প্রকৃতিকে জানার অপার কৌতূহল তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন স্কুল পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও। মেয়ে লুসি হকিংয়ের সাথে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ছোটোদের জন্য জর্জ সিরিজের প্রথম বই George's Secret Key to the Universe। স্কুল পড়ুয়া কৌতূহলী ছোট্টো ছেলে জর্জের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। মহাকাশবিদ্যা সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞানের সাথে কল্পনা মিশিয়ে লুসি ও স্টিফেন বুনেছেন এক অসাধারণ কাহিনির জাল। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় George's Cosmic Treasure Hunt (২০০৯), George and the Big Bang (২০১১), George and the Unbreakable Code (২০১৪) এবং George and the Blue Moon (২০১৬)। এর মাঝে ২০১৩ সালে তিনি লিখেছিলেন আত্মজীবনীমূলক বই My Brief History । সফল বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক এই দুই সত্ত্বা ছাড়াও সমসাময়িক প্রজন্মের অন্যতম চিন্তক ছিলেন অধ্যাপক হকিং। একদিকে যেমন ভিয়েতনামের যুদ্ধ বা উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রতিবাদে দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থান জানিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বার বার নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। দৈহিক প্রতিবন্ধকতা এতটুকু খর্ব করতে পারেনি তাঁর sense of humourকে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানকে সম্বল করে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় প্রবলভাবে বেঁচে ছিলেন স্টিফেন হকিং। আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন সেলিব্রিটি বিজ্ঞানী। জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ডসহ প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন জানা ও বোঝার দরজা সাধারণের জন্য খুলে দিয়ে ঋদ্ধ করে গেছেন মানব সভ্যতাকে।

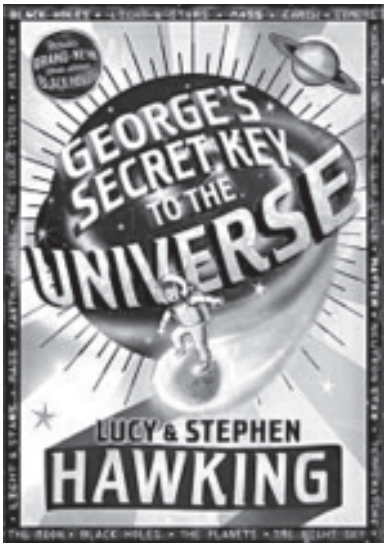

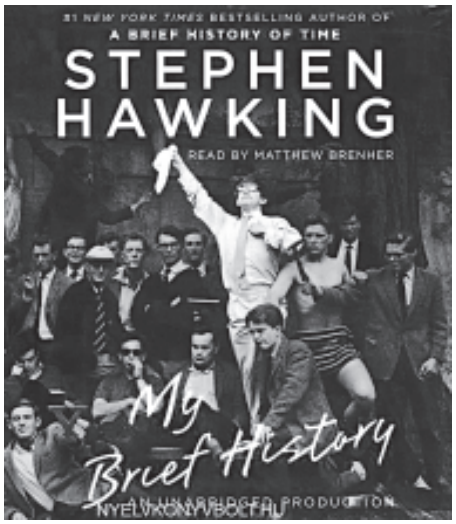

M : 9434377067 ● E-mail : acnbu13@gmail.com

জয়শ্রী দত্ত

যে গাছ দুধ দেয়

জার্মান প্রকৃতিবিদ ব্যারন ভন হামবোল্ট আর ফরাসি উদ্ভিদবিদ এমি বনপ্লান্ড বেরিয়েছিলেন বৃক্ষ অভিযানে। ইচ্ছে ছিল নতুন নতুন গাছ খুঁজে বেড়ানোর। সময়টা ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪-এর মধ্যে কোনও একটা বছর। সে সময় তাঁরা পৌঁছেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলাতে। ওখানে একটা গাছ দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেছিলেন। শুকনো অনুর্বর পাহাড়ের ফাঁকে দাড়িয়ে থাকা শুকিয়ে যাওয়া বড় একটা গাছ। গাছটা দেখে তাঁদের মনে হয়েছিল ওটা বট বা ডুমুর জাতীয় কোনও গাছ; পাতা অনেকটা ডুমুর পাতার মতো বড়। খরখরে পাতাগুলোও শুকিয়ে গেছে। তাঁরা দেখলেন যে গাছটাকে ওঁরা ভেবেছিলেন শুকিয়ে গেছে, স্থানীয় আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা এসে সেই গাছের বাকলই চিরে দিল, আর তখনই সেই চেরা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল দুধের মতো সাদা তরল পদার্থ; তারা পাত্র ভরে নিয়ে গেল সেই দুধ। ওরা সেই তরল পদার্থ দুধের মতোই পান করত। স্থানীয় আদিবাসীরা হামবোল্টদের ওই দুধ পান করতে দিয়েছিল। পানপাত্রটা তৈরি করেছিল কালাবাস ফলের খোলা দিয়ে; কালাবাস ফলটাকে আমরা 'দুরিয়াবেল' নামেও চিনি। ফলের খোলাটা বেলের মতোই শক্ত। ফলগুলো বড়, প্রায় দশ নম্বর ফুটবলের আকারে। ফলের শাঁসের রঙ কালো কিন্তু স্বাদ অনেকটা বেলের মতো।

হামবোল্ট লিখেছেন, যথেষ্ট পরিমাণে ঐ দুধ খেয়েই তাঁরা রাতে শুতে গেছিলেন। ওই দুধ গবাদি পশুর দুধের থেকে একটু বেশি ঘন হলেও খেতে খারাপ নয়। ওখানকার ক্ষেতে যারা কাজ করে তারা ওই দুধ পান করার সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টার রুটিও ওই দুধে ভিজিয়ে খায়। ওখানকার কৃষি খামারের ওভারসিয়র হামবোল্টদের বলেছিলেন, কৃষি খামারের কর্মচারীরা ওই দুধ বেশি পরিমাণে খেলে মোটা হয়ে যায়।

হামবোল্টদের ওই দুধ খেয়ে মনে হয়েছেন দুধটা মিষ্টি ও সুস্বাদু। তবে ওই দুধের অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ধর্মের জন্য ঠোঁট ও তালুতে একটু টান ধরে।

গাছটার বিজ্ঞান সম্মত নাম ব্রসিমাম গ্যালাক্টোডেনড্রন (*Brosimum galactodendron* D. Don ex sweet)। ইংরেজিতে বলে কাউ ট্রি (Cow Tree), গোত্র— মোরেসি (Family Maraceae)। প্রসঙ্গতঃ বট ও ডুমুরও মোরেসি গোত্রের গাছ।

এটা ৩০ মিটারের মতো লম্বা চিরসবুজ গাছ। এর সোজা গোল গুঁড়িটার ব্যাস ৭৫ সেমি থেকে ১১৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলো বড়, একক পত্র, পাতার ধার মসৃণ। ক্যাপিটেট জাতীয় পুষ্পমঞ্জরীতে একটা মাত্র স্ত্রী ফুল আর অনেকগুলো পুরুষ ফুল থাকে। ফলগুলো শাঁস যুক্ত গোলাকার। ফলে অনেক বীজ থাকে।

ব্রসিমামের দুধ মায়েদের বুকের দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ান এমন মায়েরা এই দুধ বেশি খান।

গাছের দুধটা রেখে দিলে তার ওপর মোটা সর পরে। সেই সর আলাদা করে তুলে রুটির ওপরে চীজের মতো বিছিয়ে দিয়ে খাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে হামবোল্ট জানতে পারেন ঐ সর বাকি তরল দুধটাকে টকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। পাঁচ-ছয় দিন হয়ে গেলে ওই সরটা টকে যায়।

শুধু দুধ নয়, এর ফলও খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ। বীজ সহ ফলগুলো স্থানীয় অধিবাসীরা সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খেয়ে থাকে।

কৃষকেরা এই গাছের কচি ডাল ও পাতা গবাদি পশুদের খাওয়ায়, এর ফলে ওদের দুধের পরিমাণ দিনে প্রায় এক থেকে দু' লিটার পর্যন্ত বেড়ে যায়। পাকস্থলীর অসুখ ও হজমের গণ্ডগোলে এই দুধ ওষুধের কাজ করে। দুধের সর চ্যুইংগামের মতো ব্যবহার করা হয়।

গাছের বাকল মোটা কাপড় ও কম্বল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গাছের কাঠ ঘরের মেঝে ও আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

যত দূর জানা যায় মায়া সভ্যতার সময়ও এই গাছের চাষ হত। বর্তমানে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়াতে এই গাছের চাষ হচ্ছে। বীজ ছাড়াও সবুজ ডালের কলম করেও এই গাছের চাষ করা হয়।

গরুর দুধের বিকল্প হিসাবে যদি এই গাছের দুধ প্রচলিত হতে পারে তবে হয়ত গরুর দুধে অস্বাস্থ্যকর ভেজাল দেওয়ার প্রবণতা কমতে পারে।

M : 9831060548 ● E-mail : jayashree.datta@yahoo.co.in

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

নতুন গবেষণার অলিন্দে

মঙ্গল গ্রহে রোবোট মাছি পাঠাবে নাসা

বিজ্ঞানীরা সত্যি স্বপ্ন দেখার সাহস রাখেন। গত ৩০ শে মার্চ এমনই এক ঘোষণা করেছে পৃথিবীর অন্যতম মহাকাশ গবেষক সংস্থা নাসা। আমাদের সবচেয়ে কাছের লাল গ্রহটির পরিবেশ-প্রকৃতিকে আরো ভালোভাবে জানার জন্য অদূর ভবিষ্যতে সেখানে রোবোট মাছি পাঠাবেন তারা। এর আগেও নাসার পাঠানো সোজোরনার ও কিউরিওসিটি নামে দুটি রোবোট মঙ্গলের মাটিতে ঘুরে ঘুরে প্রচুর তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছে। কার্বনডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ পাতলা বায়বীয় আবহাওয়া সহ এই গ্রহটির উষ্ণ ভূপ্রকৃতির সাথে যেন পৃথিবীর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। তবে আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক বেশি করে ঘুরে বেড়াতে হবে এখানকার আনাচে কানাচে। তাই এই রোবোট মাছির পরিকল্পনা। নাসার তৈরি প্রায় ৪ সেন্টিমিটার দীর্ঘ মার্সবী (Marsbee) রা রীতিমতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াবে সেখানকার মৃত আগ্নেয়গিরি ও জলহীন সমুদ্রখাদ যুক্ত উপত্যকায়। পৃথিবীর তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহাকর্ষীয় বল সম্পন্ন এই গ্রহটির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মার্সবীর ডিজাইন তৈরিতে ব্যস্ত এখন নাসার দুই দল গবেষক।

একটুকরো জেলি নজর রাখবে দেহের অক্সিজেনের মাত্রার উপর

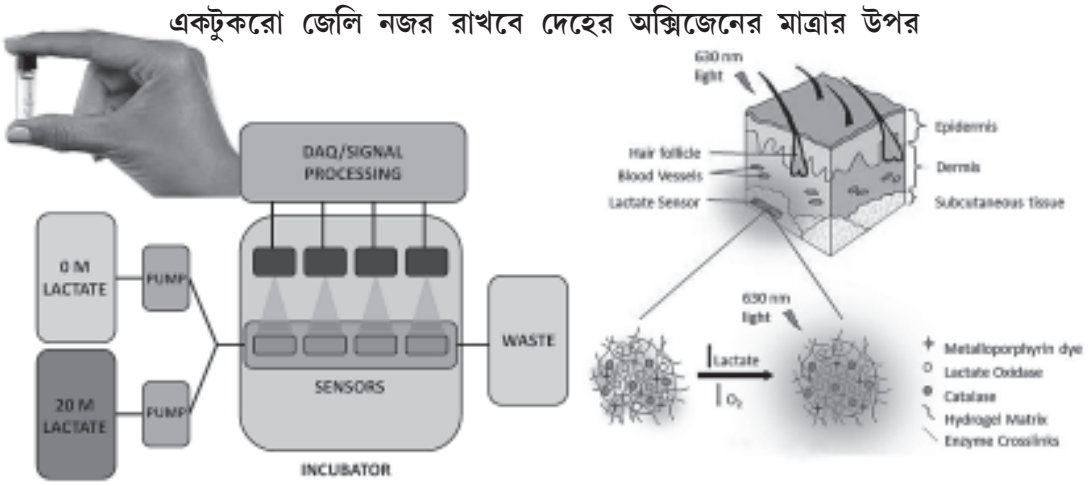

আকারে একটি চালের দানার চেয়েও ছোটো, দেহের চামড়ায় গেঁথে দেওয়া এমনই একটুকরো অনুপ্রভ (phosphorescent) হাইড্রোজেল সর্বদা নজরদারি চালাবে আমাদের দেহের অক্সিজেনের মাত্রার উপর। বিশেষভাবে প্রস্তুত সেন্সরযুক্ত এই জেলের টুকরোটি খেলোয়ারদের সঠিক শারীরিক প্রশিক্ষণ বা কোনো রোগীর চিকিৎসায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই পদার্থটির উদ্ভাবক দলের অন্যতম সদস্য ও গবেষক নাতালি উইসনিয়েস্কি (Natalie Wisniewski)-র দেহে সারে চার বছরের বেশি সময় ধরে সফল ভাবে কাজ করে চলেছে এই সেন্সরযুক্ত জেল। ইদানিং সানফ্রান্সিসকোর এক কোম্পানি প্রোফুসা (Profusa) পদার্থটি তৈরি করছেন। পলি (২-হাইড্রক্সিইথাইল মিথাক্রাইলেট) দিয়ে তৈরি জেলি সদৃশ এই হাইড্রোজেলটি সাধারণতঃ কনটাক্ট লেন্সে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই দেহের সাথে দীর্ঘদিন সংযুক্ত থাকতে পারে।

কিছুদিন আগেই নিউ ওরল্যান্সে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সম্মেলনে নিজেদের এই সাফল্যের কথা ব্যাখ্যা করে নাতালি বলেছেন ছোট্টো এই সেন্সরযুক্ত পদার্থটির কোনো ইলেকট্রনিক বা মেকানিক্যাল পাওয়ার সোর্স নেই, তা সত্ত্বেও দেহের চামড়ায় কেবলমাত্র একটি অপটিক্যাল রিডার স্থাপনের মাধ্যমে দেহে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপে সক্ষম। দেহ থেকে বেরিয়ে আসা অবলোহিত আলোকরশ্মি (Infrared light) হাইড্রোজেলে থাকা বিশেষ অনুপ্রভ রঞ্জক (কতগুলি নির্দিষ্ট porphyrin dye) দ্বারা চিহ্নিত হয়ে এই কাজটি করে থাকে। আমেরিকার ম্যাসাচ্যুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মাইকেল স্ট্রানোর মতে আমাদের দেহের যে কোনো প্রক্রিয়া আসলে অসংখ্য রাসায়নিক সংকেতবাহী আন্তর্জালের সমন্বয়ের প্রভাব। তাই ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রতিস্থাপনের মতো এই রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আরো অনেক তথ্য আহরণ করা দরকার।

সেন্সরযুক্ত হাইড্রোজেল তৈরির কোম্পানী প্রোফুসার গবেষকদল এখন খুঁজে চলেছেন এমন কিছু রঞ্জক যেগুলি দেহে গ্লুকোজ বা কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থগুলির মাত্রা নির্ণয়ে কার্যকরী হয়ে উঠবে। নাতালি উইসনিয়েস্কি স্বপ্ন দেখেন আরো সহজ এমন কোনো কিছু আবিষ্কারের যা অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র চামড়ায় প্রতিস্থাপন বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করিয়ে ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য অসুখের রোগীর দেহে লাগাতার সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে।

অনিন্দ্য দে

সৃষ্টিশীল গণিত বিশারদ এমি নোয়েদার

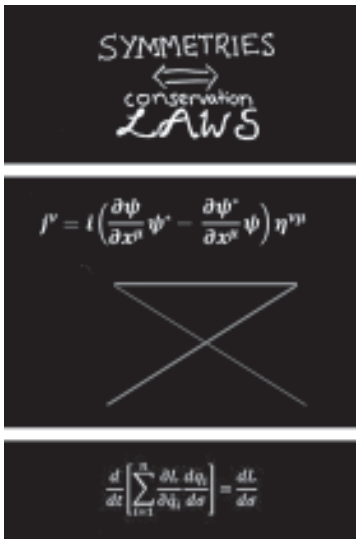

আইনস্টাইনের মতে তিনি গণিতের ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র। তাঁর উপপাদ্যকে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাথে এক পংক্তিতে বসানোর কথা ভেবেছেন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ্ লিও লেডারম্যান। ক্রিস্টোফার হিলের সাথে লেখা 'সিমেট্রি অ্যান্ড দি বিউটিফুল ইউনিভার্স' বইতে লেডারম্যান লিখছেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিতে তার আবিষ্কার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এহেন ব্যক্তিত্বকেও বারে বারে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে শুধুমাত্র নারী হিসেবে জন্ম নেওয়ার কারণে। আজকে তাঁর কথাই বলব।

ভদ্রমহিলার নাম অ্যামেলি এমি নোয়েদার। জন্মেছিলেন জার্মানীর এক ইহুদি পরিবারে, ১৮৮২ সালের ২৩ মার্চ। বাবা ম্যাক্স নোয়েদারও ছিলেন গণিতজ্ঞ, এরলাংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবথেকে বড় এমি ছোটবেলা থেকেই খুব মিশুকে। তাই সকলেরই খুব প্রিয় পাত্রী। বোধবুদ্ধিও নেহাৎ কম নয়। মাথা খাটিয়ে চটপট নানারকম হেয়ালির সমাধান করে ফেলতে ওস্তাদ ছোট্ট এমি। কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের দোহাই দিয়ে তাকে স্কুলে পাঠানো হল না। তখনকার দিনের অন্য মেয়েদের মতো শিখতে হল রান্নাবান্না আর ঘরদোরের কাজকর্ম। তবে তার সঙ্গে পিয়ানো বাদন শেখার একটা ব্যবস্থাও হয়েছিল, যদিও নাচ করা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না এমি। কিন্তু এর মধ্যেই ফরাসী আর ইংরেজি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এমি। এই দুটো ভাষার শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষায় বসলেন ১৯০০ সালে। স্বাভাবিকভাবেই খুব ভালো ফল করলেন। ফলে মেয়েদের স্কুলে ফরাসী আর ইংরেজি ভাষার শিক্ষিকা হিসেবে নির্বাচিতও হলেন। কিন্তু এমি ঠিক করে ফেলেছেন চাকরি না, তিনি আরও পড়বেন, এবং সেটা গণিত নিয়েই। ভর্তি হলেন এরলাংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৯৮৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মেয়ে মাত্র দুজন, এমি তাদের মধ্যে একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি 'সেনেট' এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গেল। তাদের মতে ছেলে ও মেয়েরা একসাথে পড়াশোনা করলে শৃঙ্খলাভঙ্গ হতে বাধ্য। তাই শ্রেণিকক্ষে বসে পড়ার অনুমতি পেলেন না এমি। তা সত্ত্বেও ১৯০৩ সালে গ্র্যাজুয়েট হলেন এমি। মাঝখানে কিছুদিন গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও শিখে এলেন গণিতের নতুন নতুন তত্ত্বের কথা। সান্নিধ্য পেলেন কার্ল সোয়ার্ৎজচাইল্ডের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানী, হেরম্যান মিনকাওয়াস্কি, ফেলিক্স ক্লেইন, ডেভিড হিলবার্টের মতো গণিতজ্ঞের।

১৯০৪ সালে পল গর্ডানের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করলেন এরলাংগেনে। ১৯০৭ সালে গবেষণার কাজ শেষ করে এমি পড়াতে শুরু করলেন ম্যাথামেটিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ এরলাংগেনে। কিন্তু আবারও সেই একই বঞ্চনা। মহিলা হওয়ার কারণে টানা সাত বছর তাঁকে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হল না। কিন্তু এর মধ্যেই চালিয়ে গেছেন নিরন্তর পড়াশোনা। লিখেছেন বীজগণিতের ইনভ্যারিয়ান্ট তত্ত্ব ও গ্যালোইস তত্ত্ব বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র। বিশেষ করে হিলবার্টের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলো এই সময়েই।

১৯১৫ সালে হিলবার্ট আর ক্লেইন তাঁকে আহ্বান জানালেন পৃথিবী

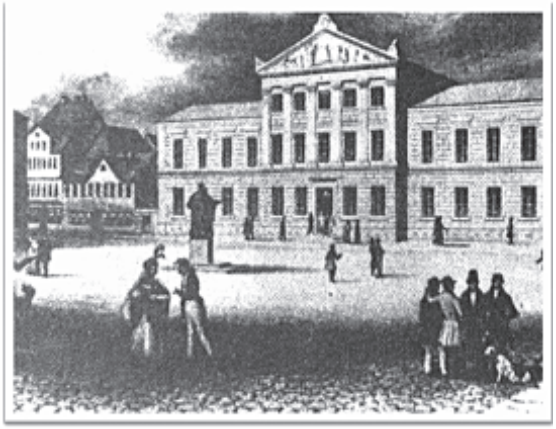

গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়

বিখ্যাত গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানেও সেই একই সমস্যা। আপত্তি উঠল এমির নিয়োগ নিয়ে। কেউ কেউ বললেন : যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সৈনিকেরা যখন দেখবে একজন মেয়ের পায়ের কাছে বসে তাদের পাঠ নিতে হচ্ছে, সেটা মোটেও সুখকর হবে না। এর তীব্র প্রতিবাদ করে হিলবার্ট বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় তো আর বাথরুম নয়

যে সেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিভেদ করতে হবে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। প্রথম চার বছর তাকে বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করতে হয়েছিল। পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তাঁকে বাড়ি থেকে টাকা আনতে হত। তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দিতে হত অধ্যাপক হিলবার্টের নামে। কিন্তু এই কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেও তিনি অবিচল থেকেছেন তাঁর গবেষণায়। জন্ম দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত 'নোয়েদার উপপাদ্যে'র, পদার্থবিদ্যার সংরক্ষণ সূত্রগুলোর সাথে প্রতিসাম্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের ছবি। যেমন, সময়ের প্রতিসাম্যের কারণেই যে শক্তি সংরক্ষণের ব্যাপারটা ঘটছে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এখান থেকেই। অর্থাৎ, একটা বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে তার চলার পথটা আজকে যেরকম দেখাবে, বলটাকে একইভাবে ছোঁড়া হলে কালকেও ঠিক সেরকমই দেখাবে। বিংশ শতকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার ক্রমবিবর্তনের এটাই ছিল অন্যতম প্রধান গাইড লাইন। ফলত কিছুটা বাধ্য হয়েই গটিংগেন ১৯১৯ সালে তাঁকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মেনে নিল, যদিও পরের তিন বছর পর্যন্ত তাঁকে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হল না। ১৯২২ সালে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে নিয়োগ করা হল সহকারী অধ্যাপক হিসেবে।

এর মধ্যেই এমি কিন্তু তাঁর গবেষণার অভিমুখ একেবারে পালটে ফেললেন। ইতিহাসের এই পর্বে গ্রুপ থিয়োরি, রিং থিয়োরি, গ্রুপ রিপ্রেজেন্টেশন আর সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অসামান্য গবেষণাপত্রগুলো থেকে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যালজেব্রার জন্ম হয়েছিল বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু শুরু হল অন্য এক বিতর্ক। গণিত শুধুমাত্র ধারণা থেকে গড়ে ওঠা বিমূর্ত একটা বিষয়, নাকি বাস্তব জগতে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে এমন একটা বিষয়, সেই প্রশ্নে সারা পৃথিবীর গণিতজ্ঞেরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। এমি ছিলেন বিমূর্ততার পক্ষে। তাই বীজগণিত, জ্যামিতি, টপোলজি আর লজিক, মানে যুক্তির সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছিলেন গণিতের এক নতুন ধারা। পরবর্তী কালে নন্-কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রা এবং হাইপার কমপ্লেক্স সংখ্যা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন তিনি। তার সাথে সাথে অনন্য গবেষকদেরও নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন এমি। বলা যেতে পারে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের তিনিই ছিলেন নেতা।

কিন্তু সে সময়েই জার্মানীর নাৎসী সরকারের উদ্যোগে শুরু হল ইহুদি বিতাড়ন। ফলে বাধ্য হয়েই দেশ ত্যাগ করতে হল এমিকে। তবে খুব বেশিদিন তাঁকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। ১৯৩৫ সালের ১৪ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় মৃত্যু হয় এই মহান গণিতজ্ঞের।

M : 9432220412 ● E-mail : anindya05@gmail.com

শি ব প্র সা দ পা ল

চোখে যখন সূর্যগ্রহণ

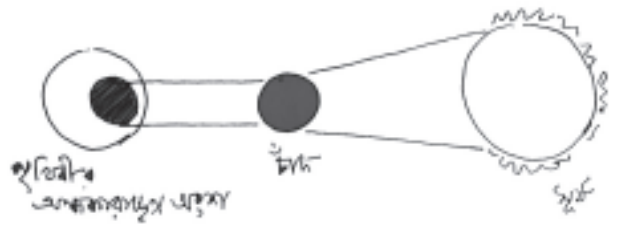

ছবি-১ : মহাবিশ্বের সূর্যগ্রহণ

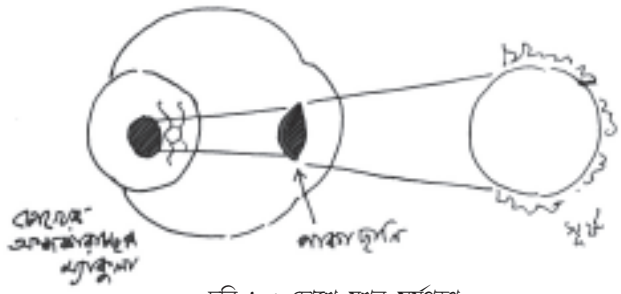

ছবি-২ : চোখে যখন সূর্যগ্রহণ

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে সবাই জান। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ এসে যায়। ফলে সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় অবস্থান করে। এ অবস্থায় সূর্যের আলো চাঁদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সূর্যের আকৃতি চাঁদের থেকে অনেক গুণ বড় হলেও দূরত্বের জন্য সূর্যের আলোকিত চাকতি চাঁদের আকৃতির সমান হয়। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে চাঁদ সূর্যকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। পৃথিবীর একটা অংশে অন্ধকার নেমে আসে। এই অকালরাত্রির জন্য পৃথিবীর ওই অংশের মানুষ দিনের বেলায় দেখতে পায় না (ছবি ১)।

এবার চোখের কথায় আসি। লেন্স স্বচ্ছ বস্তু। প্রকৃতির দৃশ্য আমরা কীভাবে দেখি? ধরা যাক একটা গাছ, সূর্যের প্রতিফলিত আলোর রশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার কেন্দ্রীয় সংবেদনশীল অংশ ম্যাকুলায় পড়ে। সেখানে গাছের উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। তারপর মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। ছানি হলে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ছানিতে বা পাকা ছানিতে কোন রশ্মি প্রতিসরিত হতে পারে না। এ অবস্থায় চোখে পাকা ছানি নিয়ে কেউ যদি সরাসরি সূর্যের দিকে তাকায় তবে কী হয়? ২ নং ছবি ভাল করে দেখ। এক প্রান্তে সূর্য অন্য দিকে চোখের গোলকার রেটিনা মাঝখানে পাকা ছানি এক সরলরেখায় অবস্থান করছে। চোখের তারা বা আইরিশকে অবশ্য ওষুধের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বড় করে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় চাঁদ যেমন সূর্যের আলোকিত চাকতি ঢেকে দিচ্ছিল এখানে গোলাকার পাকাছানি অনুরূপ ভাবে সূর্যের আলোকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিচ্ছে। ফলে ম্যাকুলাতে অন্ধকার নেমে আসে। ম্যাকুলা অন্ধকারাচ্ছন্ন হবার ফলে মানুষ অন্ধত্বে ভুগতে থাকে। অর্থাৎ দৃষ্টিক্ষমতা সাময়িক ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এও এক প্রকার সূর্যগ্রহণ। পাকা ছানি এর কারণ।

Mobile : 9433564719

অ ঙ্কি তা সে ন গু প্ত

অনন্য, অনন্ত : তারা মৌলিক

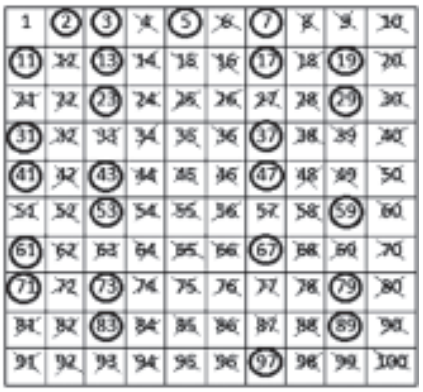

মানুষ জন্মাবধি শুধু শেখে। তার পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহার করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থিত অসীম জ্ঞানসমুদ্র থেকে অনবরত সুধাপান করাই যেন তার জীবনের একমাত্র সাধনা। এই লক্ষ লক্ষ বছরের শেখাই বিন্দু বিন্দু করে গড়ে চলেছে মানবসভ্যতা। অথচ এই শেখাগুলো যখন কাঠখোট্টা কালো কালো হরফে পড়ার বইয়ের আকারে সামনে আসে, তখন কিছুতেই বোঝা যায় না, 'এত পড়ার কী আছে?' আর সেই ভয়ঙ্কর বিষয়টি যদি অঙ্ক হয়, তাহলে তো বলার কিছুই নেই। যোগ, ভাগ, গুণ, বিয়োগ, গুণনীয়ক, গুণিতক, গ.সা.গু, ল.সা.গু, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির ভীড়ে এই প্রশ্নটাই উঁকি মারে, 'কী হবে এত অঙ্ক শিখে? সবাই কী বিজ্ঞানী হচ্ছে নাকি?'

সত্যিই তো, এত অঙ্ক শিখতে কার ভালো লাগে? কিন্তু দেখতে কত ভালো লাগে এই সুন্দর পৃথিবীকে। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় ঝলমল করে চারদিক, আর সেই আলো ভেঙে কখনও কখনও আকাশে তৈরি হয় রামধনু। 'রামধনু'তে কটা রঙ আছে?' এ প্রশ্নের

উত্তর কার জানা নেই! ৭টা। এবার যদি ফুলগুলির কাছে আসা যায়, ঘরের কাছেই ফুটে ওঠা নয়নতারা বা পয়সা ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৫। লক্ষ্যণীয়, আমাদের দেশের ৩ দিক ঘিরে বিরাজ করছে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর। বহির্জগৎ ছেড়ে মানবশরীরের কথা ভাবা যাক— সেখানেও ২টো হাত, ২টো পা, ২টো চোখ, ২টো কান। আমাদের শরীরের কোষে কোষে অবস্থিত ক্রোমোজোম যে কি না আমাদের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩

জোড়া। মাঝে মাঝেই যখন প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদেরকেই প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা! এ মাসে কটা দিন?' তখন কী মনে আসে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ৭টি মাসের জন্য ৩১টি করে দিন ধার্য করা হয়েছে। আবার অধিবর্ষগুলিতে ফেব্রুয়ারি মাসের ঝুলিতে ২৯টি করে দিন ফেলা হয়।

২, ৩, ৫, ৭, ২৩, ২৯, ৩১— এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে। গণিত জগতের কোন দুয়ার খুলতে চলেছে, হ্যাঁ, এই দরজাটার নাম 'মৌলিক সংখ্যা'।

সেই কোন ছোটবেলা থেকে আমাদের চেনাশোনা এই সংখ্যাগুলি কত দূরের মনে হয় যখন অঙ্কের বইতে খটোমটো ভাষায় লেখা থাকে, 'যে সব স্বাভাবিক সংখ্যা 1 এবং সেই স্বাভাবিক সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়, তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে ভাবলে যা দাঁড়ায় তা হল, ৫ একটি মৌলিক সংখ্যা এবং ৫ = ১ × ৫। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করলেও ১ ও ৫ ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যাবে না যাদের গুণফল ৫ হবে। একই কথা অন্য মৌলিক সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রেও খাটবে। কিন্তু এই অহঙ্কারী সংখ্যা কতগুলো আছে? সেও সবার জানা, অসংখ্য। কিন্তু শুধু 'অসংখ্য' বললেই তো হবে না। প্রমাণ করতে হবে। সেই প্রমাণের কাজটা অনেক আগেই করে গেছেন গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড, প্রায় ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তাঁর রচিত 'Elements'-এ। সত্যিই তো, গত এক বছর আমরা এই অদ্ভুত সংখ্যাটার সঙ্গে বেশ কাটিয়ে দিলাম। আর যদি একটা

ইউক্লিড

রামানুজম

মৌলিক সংখ্যার মধ্যেই এত মজা লুকিয়ে থাকে তাহলে অন্যগুলিই বা কম কীসের। তাই তো মৌলিক সংখ্যার যাত্রাপথে পথিক হয়েছেন অয়লার, ফারম্যাট, আল্‌হাজেন, রামানুজন— আরও কত গণিতজ্ঞ।

তার মানে শুধু আনন্দ পেতেই মৌলিক সংখ্যার চর্চা চলছে? তা কেন, আধুনিক সভ্যতার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এরা। একটা

উদাহরণ দেওয়া যাক— ATM Card, যা ব্যবহারের সময় একটি Pin Number ব্যবহার করতে হয়, কার্ডের মালিক ছাড়া যা কেউ জানে

না। আবার প্রতিটি Pin Number-ই ক্রমবর্ধমান মৌলিক সংখ্যার গুণফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। এই উপস্থাপনটি গোপন চাবির মতো যেকোনো ATM Machine থেকে শুধুমাত্র নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তালা খুলে টাকা তুলতে সাহায্য করে। অন্য কারোর পক্ষে এই উপস্থাপনার অনুমান করাও দুঃসাধ্য কারণ মৌলিক সংখ্যারা তো অসংখ্য। মৌলিক সংখ্যাদের অভিনবত্বের উপর নির্ভর করেই মূলত Cryptography এইভাবেই নিরাপত্তা প্রদান করে ই-ব্যাঙ্কিং ই-কর্মার্স, ই-মেইল, ওয়াই-ফাই, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল— এক কথায় ডিজিট্যাল দুনিয়ায়, যা আজ মানবজাতীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রকৃতি থেকে সভ্যতার সর্বত্র পরিব্যক্ত মৌলিক সংখ্যারা। তাই তো তাদের অন্তহীন তালিকায় নিত্যনতুন সংযোজন হয়েই চলেছে। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পাওয়া শেষ মৌলিক সংখ্যাটি হল $২^{৭৭,২৩২,৯১৭}-১$ যার অঙ্ক সংখ্যা হল ২৩,২৪৯,৪২৫। মৌলিক সংখ্যা নিয়ে চর্চা কিন্তু থেমে নেই, থামবেও না। কারণ তারা যে অনন্য। পরিশেষে একটা কথাই বলার থাকে মৌলিক সংখ্যা সম্পর্কে।

'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।'

M : 9748682580 ● E-mail : ankitasengupta57@gmail.com

রা জা রা উ ত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

আবহাওয়া ও জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনে, আবাসস্থল ধ্বংস, খাদ্য-খাদক সম্পর্কের অবনতিতে এবং সর্বোপরি, মানুষের ঋনাত্বক কৃতকর্মের ফলে পৃথিবীর বহু জীবন আজ তীব্র সংকটে। ইতিপূর্বে আমরা বহু প্রাণীকে হারিয়েছি যাদের কোনদিন হয়তো ফিরে পাবো না। কিছু জীবন আজও তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থা (IUCN = International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) প্রতি বছর পৃথিবীর দুর্লভ, বিপন্ন, সংকটজনকভাবে বিপন্ন, প্রাকৃতিক আবাসস্থলে লুপ্ত এবং লুপ্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ক্যাটেগরিতে বিভিন্ন প্রাণীদের তালিকা প্রকাশ করে থাকে যাকে লাল তথ্য পুস্তিকা (Red Data Book) বলে।

এমনি কিছু প্রাণীদের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক—

ভারতীয় গন্ডার

সাধারণ ইংরাজি নাম : Great Indian One Horned Rhinoceros
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Rhinoceros unicornis*
গড় উচ্চতা : ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি (১৭০ সেমি.), দৈর্ঘ্য : ৩.৯০ মিটার, ওজন : ৩৬০০ কিলোগ্রাম
গড় আয়ু : ৬০-৭০ বছর।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এদের খরগ/ খর্গ (horn), খুলির সঙ্গে যুক্ত নয়, আসলে কেরাটিন নির্মিত লোম/ চুল পরস্পরের সঙ্গে শক্ত ভাবে সংযুক্ত। বড় খর্গের ওজন $২\frac{১}{২}$ কেজি।
বর্তমান অবস্থা : এদের সংখ্যা সারা ভারতে আনুমানিক ২৭৭০টির মতো।

বি. দ্র. : IUCN এবং wwf-এর যৌথ উদ্যোগে 'Indian Rhino Vision-2020' ইতিমধ্যে চালু হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হল ওই সময়কালে এর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ৩০০০ করা।

M : 9474417178 ● E-mail : rajarouthbhbl@gmail.com

ডাহর পাখি

সাধারণ ইংরাজি নাম : Great Indian Bustard
বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Ardeotis nigriceps*
গড় উচ্চতা : মাটি থেকে ৩ ফুট (প্রায় ১ মিটার)
খাদ্যভাস : সর্বভুক।

বাসস্থান : এরা মূলত রুক্ষ শুষ্ক ঘাসজমিতে বসবাস করে। এরা মাটি লাগোয়া চাষ করা জমি জায়গাগুলোতে অধিক দেখা যায়।

বর্তমান অবস্থা : সারা পৃথিবীতে এরা কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়। ব্যাপক হারে শিকার করা এবং এদের আবাসস্থল ধ্বংস করার কারণে IUCN-এর Red Data Book অনুসারে এরা সংকটজনকভাবে বিপন্ন (Critically Endangered)। সারা পৃথিবীতে আনুমানিক মাত্র ২৫০টি মতো বেঁচে রয়েছে (Bird Life International, 2011 সালের সুমারী অনুসারে)।

তবে আশার আলো-রাজস্থান সরকার 'Project Great Indian Bustard' প্রকল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে চালু করেছে। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়?

জ য় দে ব দে

রত্নে রোগ চিকিৎসা!

জ্যোতিষীরা দাবী করে মানুষের নানা রকম রোগ হয় বিভিন্ন গ্রহের প্রভাবে। যেমন শকুনী গ্রহের প্রভাবে জলবসন্ত, পুতনা গ্রহের জন্য পাতলা পায়খানা, অন্ধ পুতনা গ্রহের জন্য হাম, শীতপুতনার জন্য কলেরা হয়। এই সব গ্রহের কোনো অস্তিত্ব নেই। গ্রহগুলি কোটি কোটি মাইল দূরে থাকায় এরা মানুষের শরীরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষের দেহে রোগ ব্যাধি হয় বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় কার্যকারণের জন্য, কোনো গ্রহের ফেরে নয়।

রত্ন ব্যবসায়ীরা বলে থাকে রোগ সৃষ্টিকারী ঐ গ্রহগুলিকে শান্ত করলে রোগ দূর হবে। তাই তারা পরামর্শ দেয় গ্রহরত্ন ধারণ করতে, যা গ্রহগুলিকে শান্ত করতে পারে। যেমন মৃগীতে নীলা, অর্শ্বরোগে পলা, হৃদরোগে নীলা, একই ভাবে চুনী, পান্না, চন্দ্রকান্তমণি, সূর্যকান্তমণি, ধারণ করতে। কিন্তু রোগ চিকিৎসায় এই রত্নের কোনও ভূমিকা নেই। এই গ্রহরত্নগুলি আসলে সমুদ্রজ, খনিজ বা রাসায়নিক পদার্থ যেমন— নীলা-অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, পলা-ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ বাইরে থেকে দেহে স্পর্শ করলে কখনই রোগ সারতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে রোগ যন্ত্রণায় কাতর মানুষ চিকিৎসার অভাবে সরল বিশ্বাসে বিভিন্ন সহজ পথ তথা গ্রহরত্ন ধারণ করে। জ্যোতিষীরা এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা ব্যবসা করে ফুলে ফেপে উঠছে কিন্তু সাধারণ মানুষকে আরো জটিলতর রোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন কোনো জ্যোতিষ গ্রহরত্নে রোগ সারে বলে বিজ্ঞাপন বা প্রচার করতে পারে না। The Drug & Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954-অনুযায়ী কোন রকম অবৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন প্রচার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

জ্যোতিষীদের ব্যবহৃত রত্ন

রত্ন	*বৈজ্ঞানিক নাম*	*মূল উপাদান*
হীরা	কার্বন	কার্বন
চুনী	কোরান্ডাম	অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন
নীলা	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	,, ,,
পান্না	বেরিল	বেরিলিয়াম, ,, ,,
গোমেদ (ভারতীয়)	গারনেট	ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ,,
প্রবাল / পলা	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	ক্যালসিয়াম, কার্বন ,,
পোখরাজ	ট্রোপাজ	অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ,,
বৈদুর্য্যমনি	ক্রাইসোবেরিল	বেরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ,,

M : 8336043048

বি জ য় স র কা র

জানো কি?

পেঁয়াজ কাটলে চোখ জল আসে কেন?

আমাদের দুই চোখের উপরের দিকে ভ্রুর নীচে দুটি গ্রন্থি (Lacrimal Gland) আছে। এই গ্রন্থিতে যে জলীয় পদার্থ তৈরি হয়, তাকেই বলে অশ্রু। আমরা যখন চোখের পলক ফেলি, অশ্রুগ্রন্থি থেকে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে এসে চোখের বাইরের অংশ ধুয়ে দেয়। এই জল চোখের কর্নিয়াকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। চোখে ধুলোবালি কিছু পড়লে চোখের পাতা আপনা থেকেই খোলাবন্ধ করে অশ্রুগ্রন্থি থেকে জল এনে চোখকে পরিস্কার করে দেয়।

পেঁয়াজ কাটার সময় পেঁয়াজ থেকে বের হয় Propanethial S-oxide গ্যাস। এই গ্যাস পেঁয়াজের মধ্যেকার উৎসেচকের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার গ্যাস। সালফার গ্যাস চোখে এলে যে মৃদু অ্যাসিড তৈরি হয় তার ফলেই চোখে জ্বালা ধরিয়ে জল এনে দেয়। এই জল আসলে চোখকে ধুয়ে জ্বালা কমাতে সাহায্য করে।

হাতির স্মরণশক্তি কেমন?

ভালো স্মরণশক্তির জন্য দরকার বড় আকারের মগজ। স্থলবাসী প্রাণীদের মধ্যে হাতির মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড়। একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মস্তিষ্কের ওজন প্রায় পাঁচ কেজি, যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজির মতো। হাতি তার স্মৃতিশক্তিকে ব্যবহার করে তার জীবনধারণের প্রয়োজনে। বড় চেহারার জন্য হাতির দরকার প্রচুর পরিমাণ খাদ্য। কোথায়, কখন বেশি খাদ্যের সন্ধান মিলবে তা হাতিকে মনে রাখতে হয়। এবং সেখানে পৌঁছবার রাস্তাও তার মনে রাখা দরকার। দেখা গেছে হাতির দল খাদ্যের সন্ধানে কয়েক প্রজন্ম ধরে একই রাস্তা অনুসরণ করছে। হাতি মানুষের চেহারাও ভালো মনে রাখতে পারে। কোনো মানুষ হয়তো কোনো হাতির ক্ষতি করেছে, দেখা গেছে হাতিটি বেশ কয়েক বছর পর তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

M : 9432335882 ● E-mail : bijoysarkar4786@gmail.com

সংবাদ

পরিবেশের জন্য মানুষের পদযাত্রা

পরিবেশের রক্ষার আন্দোলন একশো বছরের বেশি পুরোনো। ১৯৭২-এর পর থেকে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই পরিবেশ বাঁচানোর জন্য সেমিনার, আলোচনা-সহ নানান পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবুও যেন পরিবেশ রক্ষা হচ্ছে না। পরিবেশে বিপর্যয় বেড়েই চলেছে।

পরিবেশ বাঁচানোর শপথ নিয়ে ১০টি দাবির সমর্থনে পরিবেশের জন্য মানুষের পদযাত্রা কমিটি ১৯ ফেব্রুয়ারি পদযাত্রা শুরু করে দার্জিলিং জেলার টাইগার হিল থেকে। মোট ৩৫দিন ধরে ১২টি জেলার প্রায় ১১০০ কিমি. পথ পরিক্রমা ২৫ মার্চ সাগর দ্বীপে শেষ হয়।

পদযাত্রায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পরিবেশকর্মীরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেন। পরিবেশের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। বিভিন্ন ক্লাব, সমাজসেবি সংগঠন, নাট্যকর্মী-সহ সর্বস্তরের মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন। পদযাত্রায় প্রচার পত্র, বিজ্ঞানের পত্রিকা, পোস্টার ট্যাবলোর ব্যবস্থা করা হয়। শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ, বনগাঁও, বারাসাত, বারাকপুর, শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ সচেতনতার জন্য পথসভা, নাটক, আলোচনা সভা, গান, কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। বহু অঞ্চলেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন। পদযাত্রা কমিটির পক্ষে কল্লোল রায়, রাহুলদেব বিশ্বাস, সঞ্জীব কাষ্ঠ, সুজয় বিশ্বাস, সুবিনয় পাল, অনুপ হালদার, রূপালি চাকলাদার, তাপস বিশ্বাস, রিনম, কৌশিক, কৌশল, সুমি সিকদার সহ পরিবেশকর্মীরা পরিবেশ সচেতনতার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনকে সার্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সর্বত্র পরিবেশ বাঁচানোর দাবিতে জোরদার প্রতিবাদ আন্দোলন হওয়া খুব জরুরী।

দার্জিলিং ম্যালে ভানু ভক্তের পদতলে জমায়েত

দার্জিলিং রাস্তায় কদম কদম বাড়ায়ে চল

দার্জিলিং-এ একটি বিদ্যালয়ে প্রচার পর্ব

চাকদহে গাছ ও জলাশয়ের জন্য ভাষণ

যশোর রোডে গাছের ফাঁকে

শান্তিপুরে পদযাত্রা

রাণাঘাটে সবুজ বাঁচাও অভিযানের সমাবেশ

হাবরায় গাছ বাঁচানোর জন্যে সঙ্গীত

সাগরসঙ্গমে পরিবেশের পথিকরা

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২৪-২৫ মার্চ কলকাতা সায়েন্স সিটি মিনি অডিটোরিয়ামে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী জাতীয় স্তরে আলোচনা সভা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান গবেষণা, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা, বিজ্ঞান ও সমাজ ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞান আন্দোলন ও বিজ্ঞান মনস্কতা বিষয়গুলি আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত ভাষণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক তপন সাহা ২ দিনের অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোকপাত করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের সেমিনারে ড. সত্যব্রত দাশগুপ্ত (সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ), অধ্যাপক অপরাজিত বসু (সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান) অধ্যাপক পলাশবরণ পাল, অধ্যাপক শিবাজী রাহা, অধ্যাপক দিলীপ বসু, সমর বাগচী, ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী, দীপক দাঁ, ডঃ রাধাকান্ত কোনার,ডঃ প্রদীপ মহাপাত্র ও তাপস মজুমদার সহ অন্যান্যরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩০০-র বেশি বিজ্ঞান অনুরাগীরা অংশগ্রহণ করেন।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার খুন

বন দপ্তরের অবহেলা ও ব্যর্থতাতেই পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড় অঞ্চলের বাঘঘোরা জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে খুন হতে হল। ১৪ এপ্রিল শিকার উৎসবের ঠিক আগের দিন। খাবারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বাঘটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বনকর্তাদের মতে এদিন দুপুরে শিকারীদের মুখোমুখি হলে রয়েল বেঙ্গল নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়ে দু'জনকে জখম করে, পরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এরপর বল্লম আর অস্ত্রের মুখে নিজেকে আর রক্ষা করতে পারেনি। বনকর্মীদের ধারণা শিকারীদের মধ্যে কেউ বল্লম বাঘের গলায় বিঁধিয়ে দেয়। গলায় বল্লম নিয়ে বাঘটি বেশ কিছু দূর ছুটে যায়। এরপর বাঘটি শুয়ে পড়ে।

১৫ এপ্রিল ঝাড়গ্রাম শহরে পরিবেশ ও পশু প্রেমীরা এক মৌন মিছিল করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিপ্লব মাহাতো বলেন বাঘকে হত্যা করার প্রতিবাদে এই মৌন মিছিল। উদ্যোক্তারা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন এবং অবিলম্বে শিকার উৎসব বন্ধ করার পক্ষে জোড়ালো সওয়াল করেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার ২০০৬ সালের বন অধিকার আইনে প্রথাগত শিকার উৎসব করার নামে বন্যপ্রাণী হত্যা করা ও দেহাংশ পাচার করা অপরাধ। অথচ বনদপ্তর ফি বছর জঙ্গল মহলে শিকার উৎসব করার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

'Public & Heal' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিবেশকর্মী শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন বাঘটি ছাড়াও এবার অন্তত ২০টি বনবিড়াল, ৪০টি বনশুয়োর, অসংখ্য মনিটর লিজার্ড, পাখি, খরগোশ শিকার করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণ ও তার সংরক্ষণ নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে জরুরী।

জ্ঞানীদিদি

অনুলিখন : ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার *অঙ্কন : জুয়েল হালদার*

ভ্রম সংশোধন

ক্রিল-এর ছবি।
গত সংখ্যায় ক্রিলের ভুল ছবি প্রকাশিত হয়েছিল।
এই জন্য আমরা দুঃখিত।

শব্দের খোঁজে ৭ : স্বাস্থ্য

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

		১		২	৩		৪	
৫							৬	৭
				৮		৯		
		১০						
						১১	১২	
১৩	১৪		১৫					
					১৬			
১৭								
					১৮			

M : 9903424119

পাশাপাশি :

২. আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বৈদ্য।
৫. শরীরে রোগের কারণ বিষয়ক বিদ্যা।
৬. চোয়াল আটকে যাওয়া ———, ইঙ্গে 'তালা'।
৮. কলকাতায় অবস্থিত এক বিখ্যাত মেডিকাল কলেজ '——— কর' মেডিকাল কলেজ।
১০. রক্ত, যে অবস্থায় আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয়।
১১. সাইকিয়াট্রিস্ট মানুষের যে রোগের বিশেষজ্ঞ।
১৩. ডাক্তারকে বাড়িতে তলব করতে যা দিতে হয়।
১৫. চেতনা বা অনুভব শক্তি।
১৬. উৎসাহের অভাব/নিরুদ্যম অবস্থা, 'মানসিক ———'।
১৭. হৃদপিন্ডে রঙের অভাবজনিত বেদনা।
১৮. ভেগাস স্নায়ুর অস্ত্রোপচার।

উপর-নীচ :

১. কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে স্থিত এই বিখ্যাত মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতাল।
৩. অস্বাস্থ্য, রোগ, এক তিনে উল্টে কবিগুরু।
৪. '——— পটি', জ্বরের তাপ কমানোর জন্য কপালে দেবার সিক্ত কাপড়ের টুকরো।
৫. যে সব জীবাণু শরীরকে রোগগ্রস্ত করে।
৭. অন্ত্রের বেদনা।
৮. পাকস্থলিতে ক্ষত বা ঘা।
৯. মানব শরীরে মূল ক্রোমোজোম, এক তিনে শিকারী '———' করবেট।
১২. রক্তে স্বাভাবিক লোহিত কণিকা। শেষ তিনে ইঙ্গে 'দৃষ্টিশক্তি'।
১৪. ক্ষাররসযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ, যা আমরা খাদ্যের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। মহাত্মা গান্ধীর "——— সত্যাগ্রহ"।
১৫. শরীরে জল এর মাত্রা কমে গেলে হাসপাতালে এটা চালু করা হয়।

গত সংখ্যার সমাধান ৬ : পাহাড়

পাশাপাশি :

১.কারাকোরাম ৬. নাথুলা ৭. হিমবাহ ৯. শন্ডোরা ১০. রকিজ ১২. মালব ১৪. ফাটা ১৫. মাকালু ১৭. সলক ১৮. লক ২০. আনদিজ ২১. পানডিম

উপর-নীচ :

২. রাজমহল ৩. মনা ৪. কৈলাশ ৫. কমোরোস ৮. হর ১১. কিলিমাজারো ১২. মানস ১৩. বরাক ১৪. ফালুট ১৬. লিসকাম ১৮. লসন

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9332283356 ● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● শিয়ালদহ স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ● স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

জগন্ময় মজুমদার

জৈব প্রযুক্তি

পেন্সিলের খুলে নিলাম কাঠ
পুঁতে দিলাম।

জলের বদলে দিই
ফোঁটা ফোঁটা হরমোন

২

পাঁক ঘাটে আমার কলম
গায়ে লাগে না—

ভুল করে একদিন এনজাইম
খেয়েছে।

Mob. 8961401423

প্রিয় পাঠক

- পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান। লেখা হবে ৬০০ অথবা ১১০০ শব্দের মধ্যে।
- পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।
- পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সরদার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in